ভাষা আন্দোলনের গান : আঙ্গিকবৈশিষ্ট্য

শাহনাজ নাসরীন ইলা*

সারসংক্ষেপ : ১৯৫২ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে এদেশের মানুষের জীবনাবেগের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং জন্ম হয়েছে ভাষারাষ্ট্র বাংলাদেশের। ভাষা আন্দোলনের প্রভাব তাই বাঙালির জাতীয় জীবনে সুদূর-প্রসারী। ভাষা আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে রচিত হয়েছে কালজয়ী বেশকিছু গান। বর্তমান প্রবন্ধে সেসব গানের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ; বৈচিত্র্যের দেশ। এদেশের সংস্কৃতিতেও তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তস্থ এই অঞ্চলের ভৌগোলিক গঠনে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড় জলাশয়; উত্তরে পাহাড় এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ব্যাপক প্রভাব কার্যকর। এই বৈচিত্র্যময় প্রভাব এ দেশের সংস্কৃতিতেও লক্ষ্যণীয়। নানা জাতি-উপজাতি, বিচিত্র ভাষাগোষ্ঠী, বিদেশাগত ধর্মপ্রচারক, রাজরাজড়ার আগমন ও শাসনের মধ্য দিয়ে এদেশে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটেছে। এর ফলে শিল্পকলা ও শিল্পচর্যায়ও সাধিত হয়েছে বিপুল বৈচিত্র্য। এদেশের সংগীতের প্রধানত কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় –

১. ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য,

২. ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিক বৈশিষ্ট্য,

৩. ব্যবসা ও যোগাযোগ সূত্রে মিশ্র বৈশিষ্ট্য,

৪. বিদেশি প্রভাবগত বৈশিষ্ট্য।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখা যায়, কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক ভিন্নতার কারণে লোকসুরের পার্থক্যগত ভিন্নতা। যেমন রংপুর অঞ্চলের ভাওয়াইয়া গান, ভাটি অঞ্চলে ভাটিয়ালি গান বা চটকা গান, সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলের

* অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i1.2

সাম্পান গান ইত্যাদি। ধর্মীয় ও দর্শনগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাউল গানে; সিলেট অঞ্চলের সুফি ও মরমী গানে; চট্টগ্রাম অঞ্চলের মাইজভান্ডারি, মুর্শিদি গানে; যশোর অঞ্চলের কবি গানে; ময়মনসিংহ অঞ্চলের জারি গান ও পালা গান ইত্যাদিতে। যোগাযোগের সূত্রে মিশ্রগীতি যেমন মানিকগঞ্জ অঞ্চলের বিচার গান, ভাটি অঞ্চলের ভাটিয়ালি গান ইত্যাদি। এর বাইরে বিদেশি সংগীত ও সংস্কৃতি-প্রভাবিত রাগসংগীত, গণসংগীত প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে রাগসংগীত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে বিকশিত হলেও বাংলায় লোকসংগীতচর্চা এত ব্যাপক যে লোকসংগীতই এই অঞ্চলের প্রধান সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

বাংলার সৃজনশীল সংগীত যেভাবেই বা যে পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হোক, সব গানই কোনো না কোনোভাবে উপরের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত। ভাষা আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে রচিত গানও এর ব্যতিক্রম কিছু নয়। এই গানে একই সাথে লোকসুর, শাস্ত্রীয় সুর, বিদেশি সুর মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তবে ভাষার গানকে অন্য সংগীত-বৈশিষ্ট্য থেকে কিছুটা আলাদা করা যায় গণমুখিতা ও প্রতিবাদী বৈশিষ্ট্যের দিক বিবেচনা করে।

ভাষা আন্দোলন যেহেতু একটি জাতির ভাষা অধিকারের সংগ্রাম এবং প্রতিবাদ ও আত্মাহুতির ইতিহাস, সেহেতু এর সাথে বিদ্রোহ, সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, বেদনা-যন্ত্রণার যোগ রয়েছে। বিশেষ করে অতীতের ব্রিটিশ বিরোধিতা, কৃষক বিদ্রোহ, চল্লিশ দশকের গণসংগীতের প্রত্যক্ষ সূচনা ও আন্তর্জাতিকতাবাদে বাংলা গান ভিন্ন এক দ্যোতনায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল। সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানে নতুন ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার মধ্যে পরিতৃপ্তির সন্ধান করতে শুরু করেছিল এদেশের মানুষ। এর মধ্যেই শোষক শ্রেণির বৈষম্যমূলক ভাষানীতি বাঙালিকে সম্বিত ফিরিয়ে দেয়। ফলে বাংলা গানে বাংলা ভাষার শুদ্ধতা বজায় রাখার প্রবণতাও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে ধরা পড়ে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানে যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দের মিশ্রণরীতি লক্ষ্য করা যায়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তা আরো দ্বিগুণ বেড়ে উর্দু-বাংলা ভাগাভাগি করে ব্যবহৃত হতে থাকে। ভাষার ওপর ধর্মীয় মূল্যবোধকে চাপিয়ে দেয়ার এই অনুদার নীতি বাঙালির জীবনে প্রহসনে রূপ নেয়। ৫২র ভাষা আন্দোলনের পর এই ধরনের প্রবণতা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয় বাঙালি কবি ও শিল্পীগণ এবং শুদ্ধ বাংলা চর্চার প্রতি প্রত্যেকে মনোনিবেশ করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে গুলি চালিয়ে ছাত্র হত্যার পর সেই সমবেত ছাত্র-জনতার মিছিল থেকে দাবি ওঠে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'নূরুল আমিনের কল্লা চাই'। ২২ ফেব্রুয়ারি হত্যাকাণ্ডের সংবাদ যখন সর্বস্তরে পৌঁছে যায়, তখন গ্রাম–গঞ্জ থেকে মানুষের মধ্যে প্রতিরোধ শুরু হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি রোববার মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে শত

শত ছাত্র-ছাত্রী জড়ো হয়। শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক', 'সর্বস্তরে বাংলা চালু কর', 'রাষ্ট্রভাষা তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন' ইত্যাদি। (রফিক ২০০৯ : ৬৭) ২৫ ফেব্রুয়ারি *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় – 'শহীদ বীরের স্মৃতিতে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের যে সব শহীদ বীর গত ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের নিষ্ঠুর গুলিতে বুকের রক্তে ঢাকার মাটি রাঙাইয়া দিয়াছেন তাহাদিগকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ হোস্টেল প্রাঙ্গণে নিজ হস্তে এক রাত্রির মধ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছেন'। (রফিক ২০০৯ : ৬৭) ভাষার গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই সংগ্রাম ও আত্মাহুতির চেতনায় স্নাত সংগীত। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির কয়েক চরণ তুলে দেয়া হলো –

সেদিনো এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে।
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকানন্দা যেনো,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষেপা বুনো ॥
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি ॥
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

'ওরা এদেশের নয়', কিংবা পূর্ব-পাকিস্তান না বলে 'বাংলার বুকে' শব্দগুলোই বলে দেয় এদেশের মানুষ সংগ্রাম, সংক্ষোভ আর আত্মদানের বিনিময়ে স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষায় কতোবেশি উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল।

ভাষার গানের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা যায় – গীতির ভাষিক শুদ্ধতা ও বাংলা শব্দের সচেতন প্রয়োগ এই গানকে পূর্ববর্তী কালের সকল গান থেকে স্বতন্ত্র ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেমন খুলনার প্রকৌশলী মোশাররফ উদ্দীন আহমদের লেখা একটি গান –

মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল
ভাষা বাঁচাবার তরে
আজিকে স্মরিও তারে

কোথায় বরকত কোথায় সালাম
সারা বাংলা কাঁদিয়া মরে
আজিকে স্মরিও তারে ॥

এরকম শুদ্ধ বাংলা ভাষার পাশাপাশি বিদেশি শব্দ পরিবর্জনের পরিবর্তে কোনো কোনো গীতিকার আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন যাতে মায়ের মুখের বুলি হিসেবে তাৎপর্য পায়, যেমন –

'মা-ও কান্দে, বাপ-ও কান্দে, কান্দে জোড়ের ভাই ।
বন্ধু-বান্ধব কাইন্দা কয় হায়রে খেলার সাথী নাই ॥

'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' এই গানের মধ্যে কাইড়া, লাইগা, কইরা, কইরো, গাঁও, গেরাম, সোনা ভাই, কওরে এই ধরনের আঞ্চলিক শব্দের সমাবেশ ঘটেছে। যাতে বাংলার কথ্য উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যগুলো উঠে আসে। আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ লোকসংগীতে বিরল নয়। কিন্তু শহুরে কবিদের মাধ্যে প্রমিত বাংলার সাথে আঞ্চলিক ও কথ্য শব্দ ব্যবহার এই সময়ের গানের উল্লেখযোগ্য দিক ।

ভাষার গানের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ভাষাকে নিয়ে বা একটি দিনকে নিয়ে বা মায়ের মুখের বুলিকে প্রাসঙ্গিক করে রচিত এই গানগুলো বাংলার সংগীতাঙ্গনে নতুন। এর আগেও যেমন ফরাসি বিপ্লবে, মে দিবসের নামে সন-তারিখ নির্দিষ্ট করে গান রচিত হয়েছে। যেমন 'এ যুগ পয়লা মে, পয়লা মে, শোনো ভাই' ঠিক এই ধরনের তারিখকে নির্দিষ্ট করে ভাষার গান লেখা হয়েছে অসংখ্য। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য – আব্দুল গাফফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি', গাজীউল হকের 'ভুলবো না ভুলবো না ভুলবো না সেই একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলবো না'। আবদুল লতিফের 'একুইশ্যা ফেব্রুয়ারির কথা কেমন কইরা ভুলিরে', 'সেবার একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে বীজ হয়েছে বোনা', আবদুল গাফফার চৌধুরীর ফাল্গুনে আজ চিত্ত আত্মভোলা, আমি কি ভুলিতে পারি একুশে ফেব্রুয়ারি', নাজিম সেলিম বুলবুলের লেখা – 'দিকে দিকে তাই ফেব্রুয়ারির শোনো ঐ জয়গান'। লোকমান হোসেন ফকিরের 'একুশ আসে জানাতে বিশ্বে ভাষার কতটা মূল্য', নাজিম মাহমুদের 'আমাদের চেতনার সৈকতে একুশের ঢেউ মাথা কুটলো', বিজয় সরকারের 'বাংলাদেশের মানুষে, ফেব্রুয়ারী একুশে', শাহ্ আব্দুল করিমের 'ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে', আব্দুল হালিম বয়াতির 'একুশে ফেব্রুয়ারি সুপ্রভাতের কালে', হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখা 'ও ভাইরে ভাই, একুশে ফেব্রুয়ারি দিনে খুশীর মধু নয়া ফাগুন রে হঠাৎ দিন দুপুরে অমানিশার ঢাকলো অন্ধকার'।

ভাষার গানের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যেমন 'ভাষা' বা 'বুলি' অথবা 'শহীদ' প্রভৃতি শব্দ মুখ্য করে গান রচনা, কিংবা মিছিলে গুলি করে ছাত্র হত্যার এই পাপাচার ও শোক জাতির ভুলে যাওয়ার নয় ইত্যাদি বিষয় বাঙালির

সংস্কৃতিতে নতুন করে সংযোজিত হয়। শহীদ মিনারে পুষ্প-অর্পণ এবং প্রভাতফেরির একটি নতুন ধারাও প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুরের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ভাষার গানে রাগসংগীত ও লোকসুরের প্রভাবেই অধিকাংশ গান পরিবেশিত হয়েছে। যেমন আবহমান বাংলার চিরায়ত ভাটিয়ালি সুরে ও কাহারবা তালে 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করলি রে বাঙালি/ তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি' এই অসামান্য গানটি রচিত। ভাটিয়ালী সুরের আবেগের দোলায় গানটির হৃদয়বিদারক আকুতিভরা ক্রন্দন যেন বাঙালি জাতির অন্তস্থলে গুমরে গুমরে উঠেছে। গানটিতে 'ও বাঙালি...' অংশে ভাটিয়ালির প্রচলিত ও পরিচিত দীর্ঘ স্বরের টান গানটির আবহ আরো ঘনীভূত করে তুলেছে। 'তোমরা বাঙালি মা ডাকিও আমার জনম দুঃখী মায়' কথাটিতে দেশের জন্য আত্মদানকারি সকল শহীদের শেষ মিনতি দেশজ সুরেই যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শিল্পী রথীন্দ্র নাথ রায় বারবার গেয়েছেন এই গানটি।

তালছাড়া

II	স	স	গ	ম	র	গ			
	রা	ষ্ট্র	ভা	ষা	০	০			
	গ	ম	প	ধ	র্স	ণ			
		ধ	প						
	আ	ন্দো	ল	ন	০	০			
		০	০						
	প	থ	ণ	থ	প		|	গম	গর
		প	ধপ	গ	ম	প	|	তো	রা
		ধ	প	ম	গ				
	ক	রি	লি	রে	০				
		বা	ঙ্গা	০	০	লী			
		০	০	০	০				

গ -া গ ম	প ধ ণধ প	পধ প ম গ	র স স গ
ঢা ০ ক র	শ ০ হ র	র০ ক তে ০	ভা ০ সা ই

র স -া -া	-া -া -গম গর	||
লি ০ ০ ০	০ ০ তো রা	

ভাষার গানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ভাষার সহজবোধ্যতা। এ ধরনের গানে বিষয়ের সঙ্গে সুরের বিস্ময়কর সহাবস্থান ঘটেছে। যার ফলে গানগুলো জাতি, ধর্ম ,বর্ণ নির্বিশেষে সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। ভুললে চলবে না যে ভাষা আন্দোলন বাঙালির পরিচয়সূত্র উদ্ধারের আন্দোলন, জাতিসত্তা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম। তাই একুশে আমাদের পরিচয়।

আবদুল লতিফ ভাষা-আন্দোলনের গানের একজন অবিসংবাদী স্রষ্টা। তাঁর গানের সংখ্যাও বিপুল। বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' গানটি দ্রুত দাদ্‌রা তালে লোকসুরে রচিত। অমর এই গানটিতে লোকজ ভাষার সঙ্গে আমাদের নিজস্ব মাটির সুরের সম্মিলনে রচয়িতা আমাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, নিসর্গ, মা-বোনের বুলি, সংগ্রাম ও শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা একত্রিশ স্তবকে তুলে ধরেছেন। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান এই গানের মধ্য দিয়ে সর্বব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়। এর ফলে পৃথিবীর দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রমজীবী মানুষের নিজস্ব রাজত্ব। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব আমাদের শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবী আন্দোলনেও এসে পড়ে এবং সংগীতেও তার ঢেউ এসে লাগে। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গানটি নজরুল বাংলায় অনুবাদ করলেন। সংগীতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণির সুরে গাওয়া হয় 'জাগো সর্বহারা'। বিশ-ত্রিশ-চল্লিশের দশকে বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের বহু গান এদেশে আসতে শুরু করলো। যেমন পার্টিশান সং ফরাসি বিপ্লবের গান – 'লা মার্সাই'– আমেরিকান রেল শ্রমিক জন হেনরীর গান। তারপরেই শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন এবং গণনাট্য আন্দোলন। অতঃপর শয়ে শয়ে গান রচিত হল শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তিকামী মানুষের কণ্ঠে ভাষা জোগালো বাংলার গীতিকার-সুরকাররা। (সলিল ১৯৯৮ : ৯৪) বিশ এবং ত্রিশের দশকে নজরুলের গানে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের দুর্জয় সাহস ও তেজস্বিতার আমেজ পাওয়া যায়। যেমন – 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' কিংবা 'এই শিকল পরা ছল' প্রভৃতি গান।

বাংলা গানে যেমন রাগসংগীতের মিশ্রণ ঘটেছে তেমনি আরো বহু ধারার লোকসংগীত, ধর্মসংগীত, Ethnic বা গোষ্ঠী সংগীত ধারার মিশ্রণ ঘটেছে। জীবনের মতো সংগীতও গতিশীল, পরিবর্তনশীল – স্টেটিক বা স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। পাশ্চাত্য পদ্ধতি তাই বাংলা গানে অপরিহার্যভাবেই মিশে এর অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে – সমকালীন জীবনের উপযোগী এক নতুন সংগীতের জন্ম দিয়েছে; যাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বিগত প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে বাংলা গানে পাশ্চাত্য পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটেছে নানাভাবে নানাদিকে। সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যে সংগীতে শিল্পে পরিবর্তন অবধারিত হয়ে ওঠে – দেখা যায় পুরনো আঙ্গিকে প্রচলিত ঢঙে আর বর্তমানকে ধরা যাচেছ না। ফরাসি বিপ্লবের Liberty, Equality and Fraternity-র আদর্শের ঢেউ এসে লাগলো বাংলার শিক্ষিত সমাজের সাংস্কৃতিক চেতনায়। এই নতুন জাতীয় চেতনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য স্বাধীনতাকামী সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বানের জন্য, নিজের দেশ নিজেদের জাতি সম্বন্ধে গর্ববোধ করার বাণী প্রকাশের জন্য প্রয়োজন হলো সংগীতের। দেখা গেল সনাতন সামন্ততান্ত্রিক মার্গ সংগীতের শ্লথ ছন্দ

ও সুর কিংবা কীর্তন, কবিগান, টপ্পা, টপ, আখড়াইয়ের সুর, ভাব, ভাষা কোনোটাই আর এই নতুন জাতীয় চেতনাকে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। নতুন ছন্দ এবং সেই ছন্দাশ্রয়ী নতুন সুর নতুন ভাবকে প্রকাশ করার জন্য সৃষ্ট হতে শুরু করল – এলো পাশ্চাত্য মার্চের ছন্দ – ওয়াজলের ছন্দ এবং সেই ছন্দোপ্রয়োগী নতুন সুর যা আর টানাটানা দীর্ঘপদী প্রচলিত বাংলা গানের সুর নয় – কাটাকাটা হ্রস্বপদী নতুন গীত রচিত হতে লাগলো যার সুরে লাগলো ফরাসি বিপ্লবের গান 'লা মার্সাইয়ের' উদাত্ত অনুভব এমন গান যা একা ঘরে বসে গাওয়ার জন্য নয় – সবাই মিলে কোরাস গাওয়ার জন্য – মিছিলে গাওয়ার জন্য – দেশকে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংগীত আর ব্যক্তিগত রইল না – সমষ্টিগত হলো– সামন্ততান্ত্রিক থেকে গণতান্ত্রিক পথে পা বাড়াল। পাশ্চাত্য সংগীত পদ্ধতির আঙ্গিক বাংলা গানে প্রয়োগ করে এক নতুন উত্তরণে নিয়ে যাওয়া হলো। (সলিল ১৯৯৮ : ৯২)

চল্লিশ দশকে সৃষ্ট ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গণসংগীতের প্রভাব ভাষার গানকে আচ্ছন্ন করেছিল। ফলে বিদেশি অর্থাৎ পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব ভাষার গানকে প্রভাবিত করেছে। পাশ্চাত্য গানের সুরের চলন ও নাটকীয় ওঠানামা, তার বলিষ্ঠতা ও স্বর ক্ষেপনের বৈচিত্র্য এ সময়ের গানে লক্ষ করা যায়। যেমন – 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটিতে পরিষ্কার গ্রিগোরিয়ান চ্যানটিং-এর প্রভাব পাওয়া যায়। ষষ্ঠ দশকে গ্রিগোরি দি গ্রেট পোপের আমলে চার্চের যে প্ল্যানসং (Plan Song) তা আমাদের মার্গসংগীতের মতোই মডেল এবং ইউনিসন-এ বা একস্বরে গাওয়া হতো। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' অংশটি দাদ্‌রা এবং 'জাগো নাগিনীরা জাগো জাগো' অংশটিতে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে মার্চের ছন্দ বৈচিত্র্যে গানটিতে একদিকে যেমন 'ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু'ধারায় মমতাময় করুণা প্রকাশ করেছে তেমনি অন্যদিকে সংগ্রামের উত্তেজনা ও প্রতিবাদের ভাষায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আবার গানটির শুরুতে করুণ সুরের হামিং-এর অংশটিতে অবলিগেটো (যা মূল সুরের বিপরীত গতিতে অন্য সুরে বাজতে থাকে) প্রয়োগ স্বজন হারানোর ব্যথাকে আরো ঘনীভূত করেছে।

{গা	গা	-া	গা	গা	-া	গা	-মা	রা	সা	রা্	পা্
আ	মা	র	ভাই	য়ে	র	র	ক্	তে	রা	ঙা	নো
পা্	রা	রা	রা	-া	গরসা	রগা	গা	-া	-া	-া	-া
এ	কু	শে	ফে	ব্	রুoo	য়াo	রী	o	o	o	o
সা	সগা	গা	রা	রা	সরগা	সা	-া	-া	সা	-া	-া
আ	মিo	কি	ভু	লি	তেoo	পা	o	o	রি	o	o
রমা	মা	মা	মা	মা	মা	মপা	পধা	-া	গা	-া	গা
ছে	লে	হা	রা	শ	ত	মাo	য়েo	র্	অ	o	শ্রু
গা	গা	মা	রা	-া	সনা্	রা	-া	রা	-া	-া	-া
গ	ড়া	এ	ফে	ব্	রুo	য়া	o	রী	o	o	o
সা	সগা	গা	রা	রা	সরগা	সা	-া	-া	সা	-া	-া
আ	মিo	কি	ভু	লি	তেoo	পা	o	o	রি	o	o

গানটির সুরে যে পর্দা ব্যবহৃত হয়েছে তা রাগমিশ্রিত, কিন্তু যে আঙ্গিকে তা ব্যবহৃত তাতে পাশ্চাত্য প্রভাব সুস্পষ্ট। বদরুল হাসানের লেখা এবং মিশ্ররাগ ও পাশ্চাত্য আঙ্গিকে আলতাফ মাহমুদের সুরে 'ঘুমের দেশে ঘুম ভাঙাতে/ঘুমিয়ে গেল যারা' গানটি ওয়ালজ্ ছন্দে রচিত। দাদ্‌রা তালে গানটি গাওয়া হয়। গানটির ইমোশন্যাল বা ভাবপ্রবণ আবেদন কোথাও মার খাচ্ছে না। এখানেই সুরকার গীতিকারের সাফল্য। একটিতে তিনি অন্তর্মুখীন আর অন্যটিতে বহির্মুখীন। এতে আমরা ব্যক্তিগত আবেদন এবং সমষ্টিগত আবেদন দুটোরই চেহারা পাচ্ছি। ছন্দবলিষ্ঠ রাগসংগীতের আবহ থাকলেও তার ব্যবহার পদ্ধতি ভিন্ন। এটি প্রভাতফেরির জন্য ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের গান। ষাটের দশকে জনতার সংগ্রামের উত্তাল প্রেক্ষাপটে রচিত 'রক্তে আমার আবার প্রলয় দোলা' গানটিতে তালফেরতা তালের প্রয়োগে সংগ্রামী উদ্দামতা ও স্বজনের আহাজারির দৃশ্যমান চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেমন – 'রক্তে আমার আবার প্রলয় দোলা' অংশটি কাহারবা তালে – 'আবার জেগেছে এ দেশের বুকে দুঃশাসনের দল' অংশটি দাদ্‌রা এবং 'শিশুর কান্না বোনের অশ্রু জননীর আহাজারি' অংশটি বৈতালিক কম্পোজিশনে দুঃশাসকের পীড়নের সঙ্গে ক্ষুধাতুরের কান্নায় ভারি হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'আবার আবার আবার লেগেছে দোলা' এখানে তিনবার আবার শব্দটি বলা হয়েছে এবং নোটের ব্যবহারে যেন আগুন মেশা রক্তে উজ্জীবনের নতুন পতাকা তুলে ধরার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা করেছে। এ সময়ের গানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো ঝোঁক দিয়ে শব্দ উচ্চারণ করা। যেমন – এই গানটিতে 'রক্তে', 'আবার', 'প্রলয়', 'ফাল্গুনে', 'ভাইয়ের', 'জেগেছে' ইত্যাদি শব্দগুলোতে বিশেষ ঝোঁক দিয়ে গাইতে হবে এর বিপ্লবী ভাব বোঝাতে। আরও একটি দিক হলো 'আমি কি ভুলিতে পারি একুশে ফেব্রুয়ারি' চরণের 'ফেব্রুয়ারি' শব্দটির তালের শেষ মাত্রায় হঠাৎ ঝোঁক দিয়ে থেমে যাওয়া। এই স্টাইলটি গানটিতে একটি আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। এ গানটির প্যাটার্ন এবং স্ট্রাকচার ওয়েস্টার্ন। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর লেখা এবং বিপ্লবী গানের অসামান্য সুরকার শেখ লুতফর রহমানের সুরে এ গানটি একটি দেশি সুর, মিশ্ররাগ এবং মার্চের ছন্দের অপূর্ব কম্পোজিশন।

II	জ	-া	স	-া	|	া	-া	-া	-া	|	জ্ঞ	জ্ঞ	স	স	|	জ্ঞ	স	স	স	I
	র	ক	তে	আ		মা	০	০	০		আ	বা	র	প্র		ল	য়	দো	০	
I	স	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	-া	|	জ্ঞ	স	স	-স	|	স	-া	-া	-া	I
	লা	০	০	০		০	০	০	০		ফা	ল	গু	নে		আ	০	০	জ্ঞ	
I	জ্ঞ	-া	স	জ্ঞ	|	স	স	ন্	স	|	র	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	-া	I
	চি	০	ত্ত	আ		ত	ত	ভো	০		লা	০	০	০		০	০	০	০	
I	ম	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	গ	|	ম	-া	-া	-া	|	া	-া	-া	-া	I
	আ	মি	কি	ভু		লি	তে	পা	০		রি	০	০	০		০	০	০	০	
I	প	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	-ম	I
	আ	মি	কি	ভু		লি	তে	পা	০		এ	কু	শে	ফে		ব	রু	য়া	০	
I	দ	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	-া	|	প	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	-া	II
	রি	০	০	০		০	০	০	০		০	০	০	০		০	০	০	০	

ষাটের দশকের আরো একটি গান 'রক্ত শিমুল তপ্ত পলাশ দিল ডাক সুনীল ভোরে' গানটির 'ছুটে চল নতুন 'প্রাতে' শব্দটিতে পা ধা র্সা স্বর প্রয়োগ এবং স্বর প্রক্ষেপণের বিশেষ গায়কীতে শপথের মশালের দৃঢ়তা এবং পরক্ষণেই 'বাজা রে অগ্নিবীণা প্রাণে প্রাণে' অংশটি সুরে ও ছন্দের অপূর্ব মিলনে মশালধারীর প্রাণে যেন অগ্নিবীণা বাদনের দ্যোতনা জাগায়। এই গানটির শেষ অন্তরায় 'স্বাধীন বাংলার' কথা এবং 'মনের মতো এই দেশ গড়ার' শপথবাক্য পর পর তিন বার 'নেবই নেব' কথাটিতে বলা হয়েছে। 'অলখের বিড়ম্বনা সাবধান' অংশে পা–, পা ধা, পা ধা স্বর প্রয়োগে দীপ্তপ্রাণদের সাবধান বাণী এবং অদেখা শত্রুদের ব্যাপারে সতর্ক করার ভঙ্গিটি ফুটে উঠেছে। এই অংশটিতে সুরের নাটকীয় পরিবর্তনে গানটি বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। সৈয়দ শামসুল হুদার কথা এবং শেখ লুৎফর রহমানের সুরে কাহারবা তালে গানটি রচিত। আবু হেনা মোস্তফা কামালের লেখা এবং অজিত রায়ের সুরে রোমান্টিক মেজাজের অসাধারণ একটি গান 'অপমানে তুমি জ্বলে উঠেছিলে সেদিন বর্ণমালা'। গানটি ঊনসত্তরের মহান গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে রচিত হলেও গানটির সুরে সময়ের উত্তেজনা প্রকাশ পায়নি, শুধুমাত্র দিনবদলের শুরুর জন্য দুঃশাসনের তালা ভাঙার বলিষ্ঠতা ছাড়া। এটি একেবারেই আধুনিক সুরে মেলোডিপ্রধান নাগরিক গান। কথার সাথে অপূর্ব সুরের মিলনে দাদ্‌রা তালের এই গানটি সুরের অপরূপ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

আবদুল লতিফ, শেখ লুতফর রহমান, আলতাফ মাহমুদ, গাজীউল হক, নিজামুল হক, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, মোশাররফ উদ্দীন এবং গ্রামীণ গীতিকবিদের মধ্যে রমেশ শীল, শাহ আবদুল করিম, মাহিন শাহ, আবদুল হালিম বয়াতি প্রমুখ ভাষা আন্দোলনের কালজয়ী গানের উল্লেখযোগ্য গীতিকার ও সুরকার।

সুরের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় দেখা গেল এ সময়কালের গানে প্রধানত চার ধরনের সুরের প্রয়োগ ঘটেছে –

১. লোকসুর
২. শাস্ত্রীয় সুর
৩. আধুনিক সুর
৪. বিদেশি সুর

লোকসুর এবং ছন্দ সহজেই বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করে জনচিত্তকে আকৃষ্ট করে। কোনো সুরই শাস্ত্রীয় সংগীতের ঊর্ধ্বে নয়। তাই লোকসুরেও সচেতন বা অবচেতনভাবে হোক কোনো না কোনো রাগ সংগীতের আভাস পাওয়া যায়। ভাটিয়ালি সুরে খাম্বাজ, পিলু, ভীমপলশ্রী, পটদীপ রাগের প্রভাব এবং সারি ও বাউল গানে ভৈরবী, বেহাগ, ভৈরব, আশাবরী, জয়জয়ন্তী, বিলাবল রাগের প্রভাব পাওয়া যায়। (মৃদুলকান্তি ১৯৯৯ : ২৩) সময়, পরিপার্শ্ব, পরিবেশ, পরিস্থিতি সংগীত রচনার

একটি বড় নিয়ামক। বক্তব্য-প্রধান এসব গানে সময়ের প্রয়োজনে সুরকার তাঁর রুচি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আধুনিক সুর প্রয়োগ করেছেন। বৈদিক যুগে সামগান সম্মেলকভাবে গাওয়া হতো। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থীরা তাদের গানের সাধনসংগীত সম্মেলকভাবে গাইতেন বলে জানা যায়। বাংলা গানে সর্বপ্রথম কোরাস গান প্রচলনের কৃতিত্ব দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের। সলিল চৌধুরী পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে কোরাস গান নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্টি হয়েছে অনবদ্য কোরাস গান। সংগ্রামী, বিপ্লবী এসব গানের প্রবণতাই হলো কোরাস বা ইউনিয়ন পদ্ধতিতে গাওয়া। সহজ পাশ্চাত্য, ছন্দপ্রধান সুর যা মানুকে সহজে আকর্ষণ করে সেসব পাশ্চাত্য সুরই এসব গানে ব্যবহৃত হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে বিপ্লবী বা সংগ্রামী গানের সুর প্রয়োগের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। গণমানুষের কাছ পৌঁছানোই এই সকল গানের উদ্দেশ্য। এ সকল গানের সুরকে প্রতিবাদী সুর বা সংগ্রামী সুর বলা চলে।

গ্রন্থপঞ্জি

আহমদ রফিক (জুলাই ২০০৯)। *ভাষা আন্দোলন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

সলিল চৌধুরী (১৯৯৮)। *সমকলীন বাংলা তথা ভারতীয় সংগীতে পাশ্চাত্য সংগীত পদ্ধতির প্রভাব*, বাংলা সংগীত মেলা, কলিকাতা

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী (১৯৯৯)। *লোকসংগীত*, প্যাপিরাস, ঢাকা